ইউনিট ৮: প্রেষণা, শিক্ষণ এবং শিখন
Motivation, Teaching and Learning

ভূমিকা

মানুষের চাওয়ার শেষ নেই। একজন মানুষ হয়ত এমহূর্তে একমুঠো খাবার চাইছে কিংবা একটু আশ্রয়। আরেকজন হয়ত চাইছে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে; আবার আরেকজন হয়ত করছে প্রিয় মিলনের আশা। মানুষ সারা জীবন ধরে বিভিন্ন কাজ করে যাচ্ছে। তাদের এই বিচিত্র কর্ম প্রবাহের মূলে রয়েছে কোন না কোন প্রেষণা। কোন কোন প্রেষণা ক্ষণকালের জন্য মানুষকে সক্রিয় ও সচেষ্ট করে তোলে, আবার কোন কোন প্রেষণা দীর্ঘদিন, এমনকি সারা জীবন ধরে মানুষকে কর্ম প্রেরণা যোগায়। মানব জীবনে তাই প্রেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এ অধ্যায়ে প্রেষণা, প্রেষণা চক্র ও প্রেষণার বৈশিষ্ট্য, প্রেষণার প্রকারভেদ এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রেষণার গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে।

পাঠ ৮.১ : প্রেষণা ও প্রেষণা চক্র

পাঠ ৮.২ : প্রেষণার শ্রেণি বিভাগ এবং শিক্ষণ শিখনে প্রেষণা

পাঠ ৮.৩ : মাশ্‌লোর তত্ত্ব এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ

পাঠ ৮.৪ : শিক্ষকের জন্য মনোবিজ্ঞান

পাঠ- ৮.১: প্রেষণা ও প্রেষণা চক্র

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রেষণার সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- প্রেষণা চক্রটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রেষণার বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।

প্রাণীর অন্তর্নিহিত শক্তি যেভাবে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গতি লাভ করে এবং নির্দিষ্ট দিকে পরিচালিত হয় তাকে প্রেষণা বলে। সেজন্যই প্রেষণাকে আচরণের চালিকা শক্তি বলে। যে কাজ ব্যক্তির কোন ইচ্ছাকে পুরণ করতে সমর্থ হয় সে ঐ কাজটিই করতে উৎসাহ বোধ করবে। সুতরাং দেখা যায় যে, প্রেষণা ব্যক্তির আচরণে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে এবং সময় ও স্থান বিশেষে কোন কোন আচরণের সংঘটনের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয়। তাই শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে প্রেষণা একটি গুরুতপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত। এই পাঠে প্রেষণা, প্রেষণা চক্র এবং প্রেষণার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হবে।

প্রেষণা শব্দটির উৎপত্তি বাংলা 'প্রেষ' শব্দ থেকে যার অর্থ চাপ। ইংরেজি Motivation শব্দটির আদি রূপ হল গ্রিক বা ল্যাটিন শব্ধ Movers যার দ্বারা জীবের সক্রিয়তা বা নড়াচড়াকে বোঝানো হয়। অন্যদিকে গ্রিক Movers-এর আধুনিক ইংরেজি রূপ Motive-কে ধরা যায়। যার অর্থ নড়ন, চলন বা সক্রিয়তা। Motive শব্দটির সাথে Power যোগ করে আমরা Motive Power বলতে পারি যা পূর্ণাঙ্গরূপে Motivation-এর অনুরূপ। ইংরেজি Motivation একটি নামবাচক শব্দ যার অর্থ হল আলোড়ন, তাড়না, নোদনা, সক্রিয়তা বা বল বৃদ্ধিকারক কার্যক্ষমতা ইত্যাদি। মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে Motivation শব্দটিকে প্রণোদনা, তাড়না, নোদনা, প্রেষণা রূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

মনোবিজ্ঞানে প্রেষণা শব্দটিকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। প্রেষণা এমন একটি অবস্থাকে বুঝায় যা মানুষকে কোন আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করে থাকে বা তাকে ঐ আচরণের দিকে চালিত করে। আমাদের চাহিদা বা অভাববোধ থেকে মনের ভেতরে বা বাহিরে চাপ সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য মনে যে তাড়না, নোদনা বা উদ্যম সৃষ্টি হয় তাকেই প্রেষণা বা Motivation বলা হয়।

ই. হাল বলেন, "প্রেষণা হল উদ্দেশ্য হাসিলের ক্রমাগত প্রচেষ্টা"।

ক্রাইডার ও অন্যান্যের ভাষায়, "আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজন এবং আগ্রহ যা একটি প্রাণীকে সক্রিয় করে তোলে এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুর দিকে পরিচালিত করে তাই প্রেষণা"।

উডওয়ার্থ এর মতে, প্রেষণা হল ব্যক্তির এমন একটি অবস্থা বা গতি যা তাকে কোন আচরণের জন্য বা কোন অভীষ্ট উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য উদ্বুদ্ধ করে।

John L. Vegall বলেন "Motivation refers to processes, that initiate, sustain and direct our behaviour". অর্থাৎ প্রেষণা সৃষ্টির মূলে রয়েছে কোন কিছুর অভাব, এবং সেই অভাব দূর করার জন্য ব্যক্তির মধ্যে এক ধরনের শক্তি বা তাড়নার সৃষ্টি হয় যা তাকে ঐ অভাব পুরণ করার লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়। তাছাড়া অভাব সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে তার মধ্যে অভাব পূরণের উপায় সম্পর্কে একটি ধারণা সৃষ্টি হয়, একে বলে উদ্দেশ্য। অতঃপর সে ঐ উদ্দেশ্যমূলক আচরণ করে অভাব পূরণ করে অর্থাৎ লক্ষ্যবস্তু অর্জন করে। প্রাণির জীবনে

প্রেষণার এই অবস্থাগুলিকে ধারাবাহিকভাবে সাজালে নিম্নরূপ একটি চিত্র পাওয়া যায়, যাকে বলে প্রেষণার চেইন বা শিকল। আবার এই শিকলকে চক্রাকারে সাজালে যা পাওয়া যবে তা হল প্রেষণা চক্র।

চাহিদা → তাড়না → উদ্দেশ্য → আচরণ → লক্ষ্য অর্জন → চাহিদার পরিসমাপ্তি →

প্রেষণা একটি অবিরাম প্রক্রিয়া কারণ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রাণির অভাববোধ থেকেই যায়, তা কখনো শেষ হয়না। অতএব এক প্রেষণার পরিসমাপ্তি হলে অপর প্রেষণার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ মানুষ আবার আর একটি প্রেষিত আচরণের জন্য সক্রিয় হয়ে উঠে। এভাবে তার জীবন ব্যাপী কোন না কোন প্রেষিত আচরণ চলতেই থাকে।

প্রেষণার উৎস (Source of Motivation)

অপরিতৃপ্ত মানসিক ও জৈবিক চাহিদা মানুষের মনে একটি অস্থিরতা সৃষ্টি করে, এই অস্থিরতার ফলে মানুষের আচরণের নোদনা বা তাড়নার সৃষ্টি হয়। যতক্ষণ না তার চাহিদার তৃপ্তি ঘটে ততক্ষণ এই তাড়না ক্রিয়াশীল থাকে। অতএব অভাববোধ বা চাহিদাই প্রেষণার প্রাথমিক উৎস। জৈবিক বা শারীরিক চাহিদাগুলো হলো অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, পানীয়, বিশ্রাম, চঞ্চলতা, যৌনাকাঙ্ক্ষা, আলো, বাতাস, মল-মূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা ইত্যাদি। মানসিক চাহিদা হলো স্বীকৃতি, নিরাপত্তা, প্রেম, ভালবাসা, কৌতুহল, সৌন্দর্য পিপাসা, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ইত্যাদি। এই সব চাহিদা থেকে আমাদের বাসনা, ইচ্ছা, অনুরাগ বা আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয় এবং কোন কিছু অর্জনের জন্য চালিত করে। প্রেষণার ফলে সৃষ্ট চাহিদা শক্তি মানুষের সকল কর্মপ্রেরণার উৎস।

প্রেষণা চক্র (Motivation Cycle)

প্রেষণা-চক্রের প্রাথমিক অবস্থায় প্রাণী বা মানুষ কোন কিছুর অভাবজনিত কারণে অস্থিরতা অনুভবকরে। তারপর তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রাণি বা মানুষ কতগুলো আচরণ করে এবং সবশেষে কাংক্ষিত বস্তুটি পেলেই যা উদ্দেশ্যটি অর্জিত হলেই সেই অস্থিরভাব দূর হয় এবং সে তৃপ্তি লাভ করে। কিছু সময় পরে, প্রাণি বা মানুষের আবার প্রেষণা সৃষ্টি হয়। এভাবেই প্রেষণা প্রাণি বা মানুষের মাঝে চক্রাকারে চক্র আবর্তিত হয় আর প্রেষণার এই চক্রকারে আবর্তিত হওয়াকে বলা হয় প্রেষণা চক্র। চিত্রটি লক্ষ্য করুন:

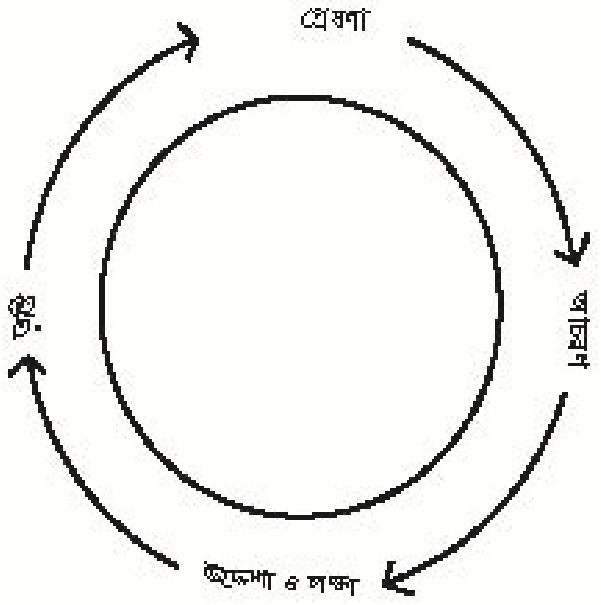

চিত্র:

বিষয়টি একটি উদাহরণের সাহায্যে বুঝানো যাক। আমাদের শরীরে পানির অভাববোধ থেকেই আমরা তৃষ্ণার্ত হই। আমরা পানি পান করার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়ি বা অস্থির হয়ে পড়ি। এটি হলো প্রেষণার প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় ধাপে পানি পাওয়ার জন্য এবং পান করার জন্য আমরা কিছু আচরণ করে থাকি। পানি পান করাতে তৃতীয় ধাপে আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। আমরা পরিতৃপ্ত হই। কয়েক ঘণ্টা যাওয়ার পর শারীরিক প্রয়োজনে আমরা আবার পানির অভাব বোধ করি এবং তৃষ্ণার্ত হই। আমরা আবার পূর্বের ন্যায় আচরণ করে থাকি। এভাবেই আমাদের আচরণ আবর্তিত হয় বিশেষ কোন প্রেষণাকে ঘিরে।

প্রেষণার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Motivation)

মানুষের মধ্যে যে কোন আচরণ সংঘটিত হলেই যে তা আচরণ প্রেষিত হবে তা বলা যায় না। কারণ সব আচরণই প্রেষিত না হয়ে অন্য কিছু হতে পারে। প্রেষিত আচরণ হওয়ার জন্য যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে যদি সেগুলি আচরণের পেছনে না থাকে তবে তাকে প্রেষিত আচরণ বলা যাবে না। নিচে প্রেষণার এই বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আলোচনা করা হল:

১. **ব্যক্তিগত চাহিদা থেকেই প্রেষণার সৃষ্টি:** ব্যক্তি নিজে থেকেই কোন কিছুর অভাব বোধ না করলে তার মধ্যে কোন প্রেষণার সৃষ্টি হবে না। তবে এই অভাববোধ স্বয়ংক্রিয়ভাবেও নিজের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে অথবা বাহ্যিক চাপের ফলেও তা হতে পারে। যেমন, ব্যক্তি যখন অনুভব করে যে তার ক্ষুধা পেয়েছে তখনই সে খাদ্যের সন্ধানে বের হবে।

২. **প্রেষিত আচরণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়:** প্রেষণা মানুষ বা প্রাণিকে বিশেষ কোন লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করে। অর্থাৎ সে কী করতে চায় সে ব্যাপারে নিশ্চিত থাকে যেমন, ক্ষুধা বোধ করলে মানুষ কেবল খাদ্যেরই সন্ধান করবে, পানির সন্ধান করবেনা।

৩. **প্রেষিত আচরণ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে:** যে অভাব থেকে প্রেষণার সৃষ্টি হয়েছে তা যদি পূরণ করতে দীর্ঘ সময়েরও প্রয়োজন হয় তবুও মানুষ ধৈর্যের সাথে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. প্রেষণা শব্দটির উৎপত্তি কোন শব্দ থেকে?
   ক. প্রেষ
   খ. প্রেষণ
   গ. প্রেশ
   ঘ. প্রেস

২. "প্রেষণা হল উদ্দেশ্য হাসিলের ক্রমাগত প্রচেষ্টা" এটি কার উক্তি?
   ক. ক্রাইডার
   খ. ই. হাল
   গ. উডওয়ার্থ
   ঘ. ম্যাকডুগাল

উত্তরমালা: ১. ক, ২. খ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. প্রেষিত আচরণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত– আলোচনা করুন।
২. প্রেষণার উৎসগুলো উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রেষণা বলতে কী বোঝায়?
২. প্রেষণা চক্রটি ব্যাখ্যা করুন।
৩. প্রেষণার বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন।

পাঠ- ৮.২: প্রেষণার শ্রেণি বিভাগ এবং শিক্ষণ শিখনে প্রেষণা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রেষণার শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার প্রেষণার বিবরণ দিতে পারবেন।
- প্রেষণার গুরত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিখন ও প্রেষণা প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

পূর্ববর্তী পাঠ থেকে আমরা জেনেছি যে প্রেষণা একটি মনোবৈজ্ঞানিক ধারণা। প্রেষণাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখানো যায়না বরং প্রেষণার ফলে যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে কোন আচরণের সৃষ্টি হয় তবেই বোঝা যায় যে ঐ ব্যক্তি প্রেষিত আচরণ করছে। একইভাবে প্রেষণার শ্রেণিবিভাগের ব্যাপারেও মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেক মতভেদ রয়েছে। প্রেষণার ধরণ, বৈচিত্র্য বা প্রকৃতি অনুযায়ী এটাকে নানাভাবে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন প্রকৃতি অনুযায়ী মনোবিজ্ঞানীরা প্রেষণাকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন, যথা– জৈবিক প্রেষণা ও সামাজিক প্রেষণা। মানব জীবনে উভয় ধরনের প্রেষণাই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বর্তমান পাঠে প্রেষণার শ্রেণী বিভাগ এবং প্রেষণার প্রয়োজনীয়তা এবং শিখন ও প্রেষণা প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হল।

প্রেষণার প্রকারভেদ (Classifications of Motivation)

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমাদের অনেক চাহিদা বা প্রয়োজন রয়েছে। এসব চাহিদা থেকে আমাদের মধ্যে এক ধরনের তাড়না বা প্রেষণা সৃষ্টি হয়। এই প্রেষণাকে সাধারণত জৈবিক এবং সামাজিক এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। বন্ধুরা, জৈবিক ও সামাজিক কারণে আমাদের মধ্যে যেসব প্রেষণা সৃষ্টি হয় সেগুলো আমরা নিচের ছকে আলাদা করে লিখি এবং নিচের অনুচ্ছেদের সাথে মিলিয়ে নেই।

জৈবিক বা দৈহিক প্রেষণা	সামাজিক প্রেষণা

আমাদের প্রয়োজন অনেক, তাই আমাদের অভাবও অনেক। এই প্রয়োজন ও অভাব মেটাতে আমাদেরকে অনেক জিনিস গ্রহণ করতে হয়, আবার অনেক জিনিস ত্যাগ করতে হয়। প্রয়োজনটি হতে পারে জৈবিক বা মানসিক। প্রয়োজনের বিভিন্নতার জন্য প্রেষণাও বিভিন্ন হতে পারে। তবে মনোবিজ্ঞানীগণ প্রেষণাকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করেছেন, যথা– (১) জৈবিক প্রেষণা ও (২) মানসিক ও সামাজিক কারণে সৃষ্ট প্রেষণা। আবার শিক্ষামূলক আচরণের ক্ষেত্রে প্ররোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রেষণাকে অন্য দু'ভাগেও বিভক্ত করা হয়েছে, যেমন– অন্তর্নিহিত (Internal) প্রেষণা ও বাহ্যিক (External) প্রেষণা।

জৈবিক প্রেষণা (Biological Motivation)

যে প্রেষণাগুলো প্রাণীর জীবন ধারনে সহায়তা করে অর্থাৎ তাকে বাঁচিয়ে রাখে সেগুলিকেই জৈবিক প্রেষণা বলে। যেমন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, কাম প্রবৃত্তি ইত্যাদি। জৈবিক প্রেষণা প্রাণীর আচার আচরণ ও কর্মপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেহেতু এই প্রেষণাগুলো জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য এবং জন্মগতভাবেই প্রাণী এসব অর্জন করে তাই এগুলিকে মূখ্য বা সহজাত প্রেষণাও বলা হয়ে থাকে। ইতর প্রাণির ক্ষেত্রে জৈবিক প্রেষণাগুলো সহজ ও অবিকৃতভাবে প্রকাশিত হয় কিন্তু সমাজ, সংস্কৃতি ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে মানুষের বেলায় এসব প্রেষণা নিয়ন্ত্রিত ও ভদ্র রূপে প্রকাশ পায়। তবে কখনো কখনো আবার কোন জৈবিক প্রেষণা মানুষের মধ্যে বিকৃতভাবেও প্রকাশিত হতে পারে।

সামাজিক প্রেষণা (Social Motivation)

সমাজে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের মধ্যে এমন কতগুলো চাহিদা সৃষ্টি হয় যা তাকে জীবনে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি এনে দেয়। কিছু সামাজিক প্রেষণা আছে যেগুলি আপাতত দৃষ্টিতে সহজাত মনে হলেও সেগুলো প্রধানত শিক্ষালব্ধ ও সামাজিক। কৃতিত্ব, প্রভাব, প্রতিপত্তি, খ্যাতি, স্বাধিকার, আনুগত্য, দলভুক্তি, মর্যাদা লাভ ইত্যাদি সামাজিক প্রেষণার উদাহরণ। জৈবিক প্রেষণার মত সামাজিক প্রেষণার কোন শারীরিক ভিত্তি নেই তবে সমাজ, সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক পটভূমির প্রেক্ষিতে মানুষের মধ্যে এগুলোর বিকাশ ঘটে। সামাজিক প্রেষণা জীবন ধারনের জন্য অপরিহার্য না হলেও মানুষের কাজকর্ম ও জীবন ধারনের সাথে এগুলোর ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। প্রাণির বিভিন্ন আচরণের তাৎপর্য বুঝতে হলে জৈবিক প্রেষণার পাশাপাশি সামাজিক প্রেষণা সম্পর্কেও সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার।

অন্তর্নিহিত প্রেষণা (Internal Motivation)

জৈবিক বা সামাজিক কারণ ছাড়াও মানুষের অন্তস্থ কিছু চাহিদা পূরণের জন্যও প্রেষণার সৃষ্টি হয়ে থাকে, এ ধরনের প্রেষণাকে অন্তর্নিহিত প্রেষণা বলা হয়। যেমন, কখনো কখনো খেলতে বসলে বা পড়তে বসলে আমরা সে কাজে এতই মেতে থাকি যে খাওয়ার কথাও ভুলে যাই। এখানে খেলা বা পড়ার প্রতি যে আকর্ষণ তা এক ধরনের অন্তর্নিহিত প্রেষণা। আগ্রহ, উৎসাহ, কোন কাজে তৃপ্তি ইত্যাদি অন্তর্নিহিত প্রেষণার উদাহরণ।

বাহ্যিক প্রেষণা (External Motivation)

আমাদের সবার মধ্যেই প্রচুর পরিমাণে জৈবিক ও সামাজিক চাহিদা রয়েছে যার প্রেক্ষিতে আমরা বিভিন্ন আচরণ করে থাকি। আমাদের চারিপাশে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যেগুলি উপরোক্ত চাহিদা পূরণে বিশেষ সহায়তা করে যেমন, খাদ্য, বস্ত্র, পদমর্যাদা বা পারিতোষিক, কিছু বস্তু সামগ্রী ইত্যাদি। এসব উপাদান প্রাপ্তির আশায় মানুষের মধ্যে যে প্রেষণা সৃষ্টি হয় তাই হলো বাহ্যিক প্রেষণা।

কাজ- ১

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, বৃত্ততে কতগুলো প্রেষণা লেখা আছে। কোনটি কোন ধরনের প্রেষণা নিচের ছকে লিখুন এবং বইয়ের সাথে মিলিয়ে নিন।

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কৃতিত্ব, প্রভাব, আনুগত্য, দলভূক্তি, মর্যাদা লাভ, নিদ্রা, কাম প্রবৃত্তি, প্রতিপত্তি, খ্যাতি, স্বাধিকার, যৌনাকাঙ্ক্ষা, মল-মূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা, স্বীকৃতি, নিরাপত্তা, প্রেম, ভালবাসা, কৌতূহল, সৌন্দর্য পিপাসা।

জৈবিক প্রেষণা	সামাজিক প্রেষণা

শিক্ষায় প্রেষণার গুরুত্ব (Importance of Motivation in Education)

শিক্ষার্থীবৃন্দ, আসুন আমরা নিচের গল্পটি পড়ি।

লাবিব দশম শ্রেণির একজন মেধাবী ছাত্র। তার ইচ্ছা লেখাপড়া করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবে। কিন্তু তার বাবা একজন গরীব কৃষক। একদিন লাবিবের বাবা লাবিবে ডেকে বললেন, "বাবা আমরা গরীব মানুষ। লেখাপড়া আমাদের জন্য নয়। আমি সংসার চালাতেই হিমশিম খাচ্ছি, তোমার পড়ালেখার খরচ যোগাব কী করে? তার চেয়ে কাল থেকে তুমি আমার সাথে মাঠে কাজ কর। আমিও একটু আয়েশ পাব"। পরের দিন লাবিব কাঁদো কাঁদো স্বরে বিষয়য়টি তার প্রিয় শিক্ষক মফিজুর রহমান সাহেবকে বলল। মফিজুর রহমান সাহেব তাকে সাহস দিয়ে বললেন, হতাশ হতে নেই বাবা। সমস্যা আছে তার সমাধানও আছে। আগামীকাল থেকে তুমি আমার বাড়িতে জায়গীর থেকে পড়ালেখা করবে। আামি তোমার পড়ালেখার খরচ দিব। শিক্ষকের মুখে এমন আশার বাণী শুনে লাবিব অত্যন্ত আনন্দিত হল। বিষয়টি লাবিব তার বাবা-মাকে খুলে বললে তারাও অনেক খুশি হলেন। পরের দিন লাবিব শিক্ষকের বাসায় চলে গেল। শিক্ষক মফিজুর রহমান সাহেব তার স্ত্রী, এবং ছেলে-মেয়েরাও খুব আনন্দ চিত্তে তাকে গ্রহণ করলেন। এরপর থেকে লাবিব নিয়মিত লেখাপড়ার পাশাপাশি বাড়ির ছোটখাট অনেক কাজে মফিজুর রহমান এবং পত্নী লিলি বেগমকে সহযোগিতা করতে লাগল। তাদের সন্তান ছালমা এবং নাজমুলের লেখাপড়ায়ও সহযোগিতা করতে লাগল। অল্প কয়েকে দিনের মধ্যে লাবিব বাড়ির মধ্যমণি হয়ে উঠল। এ বাড়ি থেকেই সে এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। পরবর্তীতে সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় এবং টিউশন করে নিজের খরচ চালাতে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিষয়ে অনার্স এবং মাস্টার্স উভয় পরীক্ষায় সে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করে। এরপর সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিষয়ে প্রভাষক পদের জন্য আবেদন করে। কর্তৃপক্ষ তার যোগ্যতা বিচার বিবেচনা করে যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রভাষক পদে নিয়োগ দান করেন। এভাবেই আবিদ তার জীবনের লক্ষ্যে উপনীত হয়।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা কী বলতে পারেন কীভাবে লাবিব নানা বাধা পেরিয়ে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে উপনীত হল? বন্ধুরা, লাবিবের এই সফলতার মূলে রয়েছে তার অদম্য ইচ্ছাশক্তি। কোন কিছু পাওয়ার প্রথম শর্ত হল ইচ্ছা বা চাহিদা। আর চাহিদা থেকেই প্রেষণার সৃষ্টি। প্রেষণার উপর নির্ভর করে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবন। অদম্য প্রেষণার কারণেই মানুষ চাঁদে যেতে পেরেছে, হিমালয় জয় করতে পেরেছে। শিক্ষার্থীদের শিখনের ক্ষেত্রেও প্রেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মনোবিজ্ঞানীরা শিক্ষায় প্রেষণার ভূমিকাকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যেমন, প্রেষণা:

ক. শিক্ষামূলক আচরণে শক্তি যোগায়;
খ. শিক্ষামূলক আচরণ নির্বাচন ও নির্ধারণ করে;
গ. শিক্ষামূলক আচরণের গতিপথ নির্ণয় করে।

ক. প্রেষণা শিক্ষামূলক আচরণে শক্তি যোগায়: শিক্ষা অর্জনের জন্য মানসিক শক্তি ও উদ্যমের প্রয়োজন। শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু অর্জনের জন্য অন্তর্নিহিত ও বাহ্যিক প্রেষণাগুলিকে কাজে লাগিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে এই উদ্যম ও শক্তির সঞ্চার করি। যেসব শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এই প্রেষণাগুলি দুর্বল বা নিচু স্তরে থাকে তারা শিক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত উদাসীন হয়।

খ. প্রেষণা শিক্ষামূলক আচরণ নির্বাচন ও নির্ধারণ করে: ব্যক্তি শিক্ষা ক্ষেত্রে কী ধরনের আচরণ করবে তাও বহুলাংশে নির্ভর করে প্রেষণার গুণগত মানের উপর। যেমন, ব্যক্তির মধ্যে যদি বিশেষ কোন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় তবে যে কোন উপায়েই হোক না কেন সে ঐ বিষয় অর্জনের দিকেই ধাবিত হবে। প্রেষণামূলক নির্বাচনের একটি বৈশিষ্ট্য হলো যে, ব্যক্তি তার চাহিদার তৃপ্তির জন্য নানা রকম আচরণ করে এবং শেষ পর্যন্ত যে আচরণটি করে তার চাহিদা মিটে শুধু সেই আচরণটিই সে ভাল করে শিখে, বাকী আচরণগুলো আর শিখতে চেষ্টা করে না।

গ. প্রেষণা শিক্ষামূলক আচরণের গতিপথ নির্ণয় করে: প্রেষণার আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো ব্যক্তির আচরণকে সঠিক লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করা। বিচ্ছিন্নভাবে আচরণ করলে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব হয়না। যেমন, কেউ যদি পরীক্ষায় ভাল ফল করতে চায় তবে তাকে নিয়মিতভাবে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে হবে এবং সেই সাথে শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ রেখে সঠিকভাবে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

শিক্ষার্থীর ক্যারিয়ার গঠনের জন্য প্রয়োজন গুণগত মানের শিক্ষা। শিক্ষা ছাড়া কোন কাজেই সফলতা অর্জন করা যায় না। তাই শিক্ষাকে উন্নয়নের চাবিকাঠি বলা হয়। আর শিক্ষার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার্থীর প্রেষণা। প্রেষণা শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই চালিকা শক্তি হয়ে কাজ করে। এজন্য শৈশব থেকেই প্রত্যেকের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। তাহলে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য নিজের মধ্যে প্রেষণা জাগ্রত হলে লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে। যেমন, কোন শিক্ষার্থী যদি শৈশব থেকে ইচ্ছা পোষণ করে সে ডাক্তার হবে। তাহলে তাকে অনেক অধ্যয়ন করতে হবে, বিজ্ঞান বিভাগে পড়তে হবে, ভাল ফলাফল করতে হবে, ভর্তি পরীক্ষায় চান্স পেতে হবে এবং ভর্তির পর এমবিবিএস পাশ করতে হবে। তাহলেই না একজন ডাক্তার হওয়া সম্ভব। লক্ষ্য নির্ধারণ করলে পরবর্তী কর্মপ্রচেষ্টা আপনা আপনি আসে। লক্ষ্য ব্যক্তির মধ্যে প্রেষণা সৃষ্টি করে ব্যক্তিকে সফলতার পথে চালিত করে। সুতরাং ক্যারিয়ার গঠনে প্রেষণার ভূমিকা অপরিসীম।

শিখনে প্রেষণা সৃষ্টিতে শিক্ষকের ভূমিকা (Teacher's Role Generating Motivatio in Learning)

শিক্ষক হিসেবে আমাদের প্রারম্ভিক দায়িত্ব হবে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিখন উপযোগী প্রেষণা জাগ্রত করা। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের প্রেষণা সৃষ্টির জন্য শিক্ষক নিম্নলিখিত কৌশলগুলি অবলম্বন করতে পারেন।

১. পুরস্কার (Reward): পুরস্কারের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রেষণা জাগ্রত করতে পারেন। পুরস্কার সাংকেতিক ধরনের (Symbolic) হতে পারে বা মূর্ত বস্তুও (Concrette Object) হতে পারে। পুরস্কার মূর্ত বা বিমূর্ত বস্তু যে মাধ্যমে দেওয়া হোক না কেন তার থেকে ধীরে ধীর যাতে অন্তঃজ প্রেষণা জাগ্রত হয় সেদিকে শিক্ষকের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখাতে হবে। কারণ প্রেষণা যদি স্বয়ংক্রিয় (Automatic) না হয়, তাহলে শিখনও স্বতঃস্ফুর্ত হবে না।

২. **মূল্যায়ন (Evaluation/Assessment):** বিদ্যালয়ে শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির মূল্যায়ন তাদের শিখনমূলক প্রচেষ্টায় প্রেষণা যোগায়। আমরা সাধারণত যে পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করে থাকি, তার দ্বারা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত পারদর্শিতার তুলনামূলক বিচার করি। এই পদ্ধতিতে কোন কোন শিক্ষার্থী উচ্চ মান লাভ করে; ফলে তারা শিখন সহায়ক সু-অভ্যাস গড়ে তোলে। কিন্তু, এইসব অভ্যাস শিক্ষার্থীদের মনে স্থায়ী কোন মনোভাব গড়ে তুলতে পারে না। শিক্ষার্থীদের প্রেষণা জাগ্রত করতে হলে আমাদের মূল্যায়ন ব্যবস্থারও পরির্তন করতে হবে। দলভুক্তির চাহিদা (Need for Belongingness), আত্মশ্রদ্ধার চাহিদা (Self Esteem) এবং আত্মতৃপ্তির চাহিদা (Need for self Actualization) যাতে পরিতৃপ্ত হয়, সে অনুযায়ী মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে যাতে তার নিজস্ব চাহিদা ও ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করা যায়, সে ব্যবস্থা করতে পারলে প্রত্যেকেই উদ্দেশ্যমুখী কাজে আগ্রহী হবে।

৩. **সফলতা (Success):** কোন বিশেষ কাজে সফলতা ব্যক্তির অনুরূপ কাজে প্রবৃত্ত করে। সফলতার চাহিদার (Need for sucess) পরিতৃপ্ত করতে না পারলে শিক্ষার্থী শিখনের ক্ষেত্রে বিশেষ এবং সামগ্রিক উভয় ধরনের উদ্দেশ্যকেই বর্জন করবে। এজন্য বিদ্যালয়ে শিখনমূলক পরিস্থিতিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে তাদের ব্যক্তিগত বৈষম্য অনুযায়ী সফলতা লাভ করতে পারে, সে বিষয়ে শিক্ষককে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার্থীর নিজের সফলতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা তাকে পরবর্তী শিখনমূলক কাজে অনুপ্রাণিত করে। একথা স্মরণ রেখে শিক্ষক শ্রেণিতে পাঠ্য বিষয়বস্তু এবং পদ্ধতি নির্বাচন করবেন।

৪. **প্রশংসা (Complement):** প্রশংসা শিক্ষার্থীদের কাছে ভাষামূলক পুরস্কার (Verbal Reward) হিসেবে কাজ করে। ফলে তাদের মধ্যে প্রেষণার সঞ্চার করে। অবশ্য ভাষার ব্যবহার ছাড়াও নানাভাবে সাংকেতিক পদ্ধতিতে পুরস্কার দেওয়া যায়। প্রশংসা শিক্ষার্থীদের আত্মশ্রদ্ধার চাহিদা পরিতৃপ্তিতে সহায়তা করে।

৫. **সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা (Co-operation and Competition):** শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার (Co-operation and Competition) মনোভাব শিখনের ক্ষেত্রে প্রেষণার সঞ্চার করে। পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মনোভাব শিখনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার ব্যক্তিগত সীমিত ক্ষমতাকে পরিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করে। পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কাজে ও দলগত প্রভাবে শিক্ষার্থীদের কর্মদক্ষতা বাড়ে। সে জন্য শিখনের ক্ষেত্রে প্রেষণা জাগ্রত করতে হলে, শিক্ষক এই দুই ধরনের কৌশলই ব্যবহার করবেন।

৬. **পারদর্শিতার আকাঙ্ক্ষা (Level of Aspiration):** সবশেষে, শিক্ষার্থীদের প্রেষণা জাগ্রত করতে হলে, তাদের জন্য এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে যা তাদের সমস্ত রকম চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হল– তাদের পারদর্শিতার আকাঙ্ক্ষা (Level of Aspiration)। তাই পাঠ্য বিষয়বস্তু অবশ্যই যেন শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার আকাঙ্ক্ষার উপযোগী হয়। হ্যাবিংহার্স্ট (Habinghurst) বলেছেন, আমরা যাদি প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জৈবিক এবং সামাজিক চাহিদার পরিতৃপ্তির উপযোগী পাঠ্য বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে পারি, তাহলে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের প্রেষণা সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে। সুতরাং শিক্ষার্থীদের প্রেষণা জাগ্রত করার জন্য উপরোক্ত নীতির কথা স্মরণ রেখে আমাদের বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে।

আলোচ্য প্রেষণা সৃষ্টিকারী কৌশলগুলি ছাড়াও শিক্ষক আরও নানা ধরনের কৌশলের অবলম্বন করতে পারেন। তবে এ প্রসঙ্গে শিক্ষকের স্মরণ রাখার দরকার তার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র সাময়িক প্রস্তুতিকরণে (Readiness) নয়; স্থায়ী প্রেষণা জাগ্রত করা তার প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ রেখে শিক্ষক এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা স্থায়ীভাবে শিক্ষণের প্রতি আগ্রহী হবে এবং শিখনের ক্ষেত্রে প্রেষণাকে ধরে রাখতে পারবে। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষক নির্দিষ্ট চারটি পর্যায়ে কাজ করবেন।

প্রথমত: তিনি শিক্ষার্থীদের শিখনে আগ্রহ সৃষ্টি করবেন। শিক্ষার্থীদের কজে উৎসাহ দিয়ে তিনি এই ধরনের আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেন।

দ্বিতীয়ত: তিনি শিক্ষার্থীদের বর্তমান ক্ষমতার উপযুক্ত আত্মমূল্যায়নে সহায়তা করার জন্য তাদের সফলতা সম্পর্কে সচেতন করে তুলবেন। সফলতা সম্পর্কে সচেতনতা তাদের প্রেষণা সঞ্চারে সহায়তা করে।

তৃতীয়ত: উপযুক্ত পুরস্কার (Reward), প্রশংসা (Praise) ইত্যাদির ব্যবস্থা করে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করাও শিক্ষকের দায়িত্ব।

চতুর্থত: শিক্ষার্থীদের ভুল আচরণগুলি নিয়ন্ত্রণ করাও শিক্ষকের কর্তব্য। কারণ কোন বিষয়ের প্রেষণা জন্মগতভাবে থাকতে পারে না। তাই অনেক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.২

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. প্রেষণাকে প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা হয়?
   ক. দুই ভাগে
   খ. তিন ভাগে
   গ. চার ভাগে
   ঘ. পাঁচ ভাগে

২. কোনটি জৈবিক প্রেষণা?
   ক. কৃতিত্ব
   খ. প্রভাব
   গ. প্রতিপত্তি
   ঘ. ক্ষুধা

৩. কোনটি সামাজিক প্রেষণা?
   ক. তৃষ্ণা
   খ. নিদ্রা
   গ. খ্যাতি
   ঘ. কাম প্রবৃত্তি

৪. কোনটি অন্তর্নিহিত প্রেষণা?
   ক. খাদ্য
   খ. উৎসাহ
   গ. বস্ত্র
   ঘ. পদমর্যদা

৫. কোনটি বাহ্যিক প্রেষণা?
   ক. আগ্রহ
   খ. উৎসাহ,
   গ. কোন কাজে তৃপ্তি
   ঘ. বস্ত্র

উত্তরমালা: ১. ক, ২. ঘ, ৩. গ, ৪. খ, ৫. ঘ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. সামাজিক প্রেষণা বলতে কী বোঝায়? আলোচনা করুন।
২. প্রেষণা জাগ্রতকরণে পুরস্কারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রেষণার শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করুন।
২. জৈবিক ও সামাজিক প্রেষণার পার্থক্য আলোচনা করুন।
৩. ক্যারিয়ার গঠনে প্রেষণার ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।
৪. শিখন ও প্রেষণা প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের ভূমিকা বর্ণনা করুন।

পাঠ- ৮.৩: মাশ্‌লোর তত্ত্ব এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মাশ্‌লোর প্রেষণা তত্ত্বের মূল ধারণাটি ব্যক্ত করতে পারবেন।
- মাশ্‌লোর প্রেষণা তত্ত্বের ধাপগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।
- মাশ্‌লোর প্রেষণা তত্ত্বটি বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে বলতে পারবেন।
- শিক্ষাক্ষেত্রে মাশ্‌লোর প্রেষণা তত্ত্বটির প্রয়োগ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

শিক্ষার্থীবৃন্দ, আপনারা পূর্বের পাঠে প্রেষণা সম্পর্কে জেনেছেন। এই পাঠটিতে মাশ্‌লোর চাহিদা তত্ত্ব এবং শিক্ষায় এর প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। আপনারা ইতোমধ্যে জেনেছেন যে, প্রেষণা হলো মানুষ ও প্রাণির এমন একটি অবস্থা যা তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করে বা কর্মশক্তি দান করে। প্রেষণা থাকার জন্যই মানুষ বা প্রাণির মধ্যে কর্মস্পৃহা পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হলে মানুষ বা প্রাণির মধ্যে যে সক্রিয় বা গতীয় অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে প্রেষণা বলা হয়। প্রেষণা সম্পর্কে আব্রাহাম মাশ্‌লো (১৯৫৭, ১৯৭১) একটি তত্ত্ব প্রদান করেন যা পর্যায়ক্রমিক চাহিদা তত্ত্ব নামে পরিচিত। মাশ্‌লোর চাহিদা তত্ত্বের মূল কথা হলো মানুষ প্রথমে তার জৈবিক চাহিদাগুলো পূরণের চেষ্টা করে। তারপর পরবর্তী উচ্চতর চাহিদাগুলো পর্যায়ক্রমে পূরণে সচেষ্ট হয়। মাশ্‌লো তাঁর তত্ত্বে চাহিদাগুলোকে পর্যায়ক্রমিকভাবে বিন্যস্ত করেন। এই পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলো চিত্রের (চিত্র নং-১) মাধ্যমে নিচে দেখানো হলো।

চিত্র ১ : মাশলোর প্রর্যায়ক্রমিক চাহিদা তত্ত্ব।

শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাশ্‌লোর প্রস্তাবিত প্রেষণার চাহিদা তত্ত্ব পাঁচটি পর্যায়ক্রমিক ধাপ রয়েছে, যেমন–

ক. জৈবিক চাহিদা;
খ. নিরাপত্তার চাহিদা;
গ. স্নেহ, ভালবাসার চাহিদা;

ঘ. আত্মমর্যাদার চাহিদা;
ঙ. আত্মপূর্ণতার চাহিদা।

ক. **জৈবিক চাহিদা:** মাশ্‌লোর তত্ত্বের প্রথম ধাপটি হলো জৈবিক চাহিদার ধাপ। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা ইত্যাদি এই চাহিদার অন্তর্ভুক্ত। মানুষের চিন্তা ও আচরণ তার জৈবিক চাহিদার দ্বারা প্রভাবিত হয়। জৈবিক চাহিদার পরিতৃপ্তি না হলে আমরা পরের পর্যায়গুলোতে যেতে পারিনা। প্রাণির বেঁচে থাকার জন্য এই চাহিদার পূরণ অপরিহার্য।

খ. **নিরাপত্তার চাহিদা:** এটি চাহিদা তত্ত্বের দ্বিতীয় ধাপ। জৈবিক চাহিদা পূরণ হলেই আমাদের মাঝে নিরাপত্তার চাহিদা জাগ্রত হয়। এই চাহিদার মধ্যে রয়েছে আশ্রয়ের নিরাপত্তা, চাকুরির নিরাপত্তা, আয় ও সম্পদের নিরাপত্তা, দৈহিক নিরাপত্তা ও পারিবারিক নিরাপত্তা ইত্যাদি।

গ. **স্নেহ, ভালবাসার চাহিদা:** নিরাপত্তার চাহিদা পূরণ হলে মানুষ ভালোবাসা বা স্নেহের চাহিদা পূরণের জন্য তাড়না অনুভব করে। এই চাহিদা সামাজিক চাহিদার অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে রয়েছে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, পারিবারিক সম্পর্ক ইত্যাদি। এই চাহিদার অভাবে মানুষের মাঝে নি:সঙ্গতা কিংবা বিষাদগ্রস্ততা দেখা যায়।

ঘ. **আত্মমর্যাদার চাহিদা:** প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আত্মমর্যাদার চাহিদা থাকে। মর্যাদাবোধ তখনই আসে যখন মানুষ নিজেকে মূল্যায়ন করতে পারে। এই মূল্যায়ন যথাযথ না হলে মানুষের নিজের প্রতি শ্রদ্ধা কমে যায়, হীনমন্যতায় ভোগে, আত্মমর্যাদা ক্ষুন্ন হয়।

ঙ. **আত্মপূর্ণতার চাহিদা:** প্রথম চারটি ধাপ যথাযথভাবে পূরণ হলেই মানুষ সর্বশেষ চাহিদা অর্থাৎ আত্মপূর্ণতার চাহিদায় যেতে পারে। সবার পক্ষে এ স্তরে পৌঁছানো সম্ভব হয় না। এ পর্যায়ে ব্যক্তি নিজেকে পরিপূর্ণ করতে চায়, নিজের দক্ষতা ও সামর্থের সদ্ব্যবহার করতে চায়। মানুষ যখন এ পর্যায়ে পৌঁছায় তখন তার মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, সৃজনশীলতা ও পরিবেশের সাথে পারস্পরিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে স্বত:স্ফূর্ততা থাকে। সে নিজেকে ও অন্যকে ভালোবাসে এবং নিজেকে কাজে এমনভাবে নিয়োজিত রাখে যা নৈতিক দিক থেকে সমাজের জন্য কল্যাণকর।

শিক্ষার্থীবৃন্দ, আপনারা মাশ্‌লোর চাহিদা তত্ত্ব সম্পর্কে জানলেন। পরবর্তী অংশে মাশ্‌লোর তত্ত্বটি শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে কীভাবে প্রয়োগ করতে পারেন সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

শিক্ষক কীভাবে শ্রেণিকক্ষে মাশ্‌লোর তত্ত্বটি প্রয়োগ করবেন?

আমরা জীবনে যা কিছু করি তার সব কিছুর মূল উৎস হলো প্রেষণা। প্রেষণার যথাযথ পরিতৃপ্তির মাধ্যমে মানুষ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রে মাশ্‌লোর চাহিদা তত্ত্বটির গুরুত্ব অপরিহার্য। বিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীরা আসে, যাদের বিভিন্ন ধরনের চাহিদা থাকে। বিশেষ করে বয়:সন্ধিকালের শিক্ষার্থীদের চাহিদাগুলো সম্পর্কে শিক্ষকদের জানা প্রয়োজন। শিক্ষকরা যদি মাশ্‌লোর তত্ত্বটি সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন তবে তারা শিক্ষার্থীদের চাহিদার সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্যা নিরূপণে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেন। মাশ্‌লোর মতে শিক্ষার্থীদের কোন কিছু অর্জনের পূর্বে তাদের জৈবিক চাহিদা অর্থাৎ খাদ্যের চাহিদা নিবৃত্তি করতে হবে। মৌলিক চাহিদাই যদি পূরণ না হয় সেক্ষেত্রে তাদের বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা বা শিক্ষার চাহিদা পূরণ করতে যাওয়া নিরর্থক হবে। উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যালয়ে আগত শিক্ষার্থী যদি ক্ষুধার্ত থাকে তবে তার পক্ষে বিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করা কষ্টকর হবে। সে বিদ্যালয়ে আসলেও শ্রেণিকক্ষের পাঠে মনোনিবেশ করা কঠিন হবে। এই পর্যায়টি অর্থাৎ জৈবিক চাহিদা পূরণ না হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীদের একটি বিশাল অংশ বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে। এই প্রাথমিক চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে বর্তমানে বাংলাদেশে কিছু কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর জৈবিক চাহিদা পূরণের বিষয়টির দিকে লক্ষ্য রাখা শুধুমাত্র শিক্ষকের দায়িত্ব নয়। এটি একটি দ্বৈত দায়িত্ববোধের (Dual Responsibility) প্রক্রিয়া। শিক্ষক অবশ্যই শিক্ষার্থীদের চাহিদার প্রতি সচেতন থাকবেন। একই সাথে শিক্ষার্থীদের উচিত তাদের চাহিদা বা সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষককে জানানো, যেমন– শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদানের সময় যদি কোন শিক্ষার্থীর শ্বাসকষ্ট হয় অথবা তার পানির পিপাসা পায় কিংবা অন্য কোন সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর উচিত হবে তা শিক্ষককে জানানো। এতে করে শিক্ষক তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

জৈবিক চাহিদা পূরণের সাথে সাথে আসে নিরাপত্তার চাহিদা। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের উচিত বিদ্যালয়ে নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করা। বিদ্যালয়ে যাতে শিক্ষার্থীরা কোনরূপ অন্যায়, অবিচার, অসামঞ্জস্যতা ও আবেগিক বা শারিরিক ক্ষতির সম্মুখীন না হয় শিক্ষকদের সে বিষয়ে নজর দিতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় শিক্ষকের কঠোর মনোভাব শিক্ষার্থীর মনে ভীতির সঞ্চার করে। এতে করে শিক্ষার্থী উক্ত শিক্ষকের পাঠে অমনোযোগী হয়ে উঠে কিংবা শিক্ষককে এড়ানোর জন্য বিদ্যালয়ে সব শেষের বেঞ্চে বসে অথবা স্কুল পালানোর চেষ্টা করে।

আবার শিক্ষার্থীদের কাছ থেকেও অনেক শিক্ষার্থী ভয় বা ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় নিরাপত্তাবোধের অভাব থেকে শিশুরা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে। এসব ভয় ভীতির কারণে শিক্ষার্থীরা যাতে বিদ্যালয় থেকে ঝরে না পড়ে সেদিকেও শিক্ষকদের নজর দিতে হবে। বিদ্যালয়ের পরিবেশ শিক্ষার্থী বান্ধব করার মাধ্যমে এটি করা যেতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষক-শিক্ষার্থী সুহৃদ আন্তঃক্রিয়া। এছাড়া শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পক্ষপাতহীন, ন্যায্য, নিয়ন্ত্রিত এবং নিরাপদ পরিবেশ বজায় রাখতে সচেষ্ট হবেন। শ্রেণিকক্ষ হবে শিক্ষার্থীদের জন্য যে কোন ধরনের মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনমুক্ত জায়গা।

শিশুর খাদ্যের চাহিদা না থাকলেও অনেক সময় তারা বাড়িতে অবহেলিত হয় বা নিরাপত্তাজনিত অভাবে ভোগে। এরূপ পরিস্থিতিতে তাদের পক্ষে পাঠে মনোনিবেশ করা কঠিন হবে। বিদ্যালয়ও তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হবে এবং এক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্ব হবে শিশুর পাশে দাঁড়ানো। জৈবিক ও নিরাপত্তাবোধ নিশ্চিত হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের মাঝে পরবর্তী পর্যায়ের চাহিদা অর্থাৎ ভালোবাসা স্নেহ ও সংশ্লিষ্টতার মনোভাব জাগ্রত করতে হবে। মাশ্‌লোর মতে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার একাকিত্ব এবং বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি থেকে মুক্ত থাকতে চায়। একইভাবে শিক্ষার্থীর চাহিদা থাকে তার পরিবারের পর শিক্ষক ও সহপাঠীদের কাছ থেকে স্নেহ, ভালোবাসা পাওয়ার বা তাদের সাথে সকল কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থাকার। আর এক্ষেত্রে শিক্ষক দলীয় কাজ, আনন্দের মাঝে পাঠদানের মাধ্যমে এই অন্তর্ভুক্তি বোধকে বাড়াতে পারেন।

মাশ্‌লোর তত্ত্বের চতুর্থ ধাপ হলো আত্মমর্যাদা। শিক্ষার্থীরা তাদের যে কোন কাজের জন্য বাবা-মা, শিক্ষক ও সহপাঠীদের কাছ থেকে স্বীকৃতির ও প্রশংসার প্রত্যাশা করে। এই স্বীকৃতি বা প্রশংসা তাদের আত্মবিশ্বাস ও কাজের প্রতি উৎসাহ বাড়িয়ে তোলে। সে কারণে শিক্ষকদের উচিত এমনভাবে প্রশ্ন করা বা পাঠদান করা যাতে শিক্ষার্থী শ্রেণির কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহী হয়। শিক্ষকদের নিশ্চিত করতে হবে যে, তাদের শিখন পরিবেশ আবেগিক ও শারীরিক শাস্তিমুক্ত। কোন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় ভালো করলে তাদের প্রশংসা করা বা ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দন জানানো কিংবা খারাপ করলে তিরস্কার না করে তাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া এবং ভালো করার জন্য তারা যাতে কঠোর প্ররিশ্রম করে তার জন্য উৎসাহিত করা। শিক্ষকদের স্নেহ, ভালোবাসা ও সহানুভূতিই পারে শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ তৈরি করতে। এছাড়া বিদ্যালয়ে কিছু শিক্ষার্থী থাকে যাদের বিভিন্ন ধরনের গুণ বা দক্ষতা থাকে, যেমন– সঙ্গীত, নৃত্য, খেলাধুলার দক্ষতা ইত্যাদি। শিক্ষকরা তাদের এই সুপ্ত ক্ষমতার আত্মপ্রকাশে ভূমিকা রাখতে পারেন।

সবশেষে বলা যায়, আমাদের সকল কর্মশক্তির মূল উৎস হলো প্রেষণা। প্রেষণা আমাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করে। শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রেষণার গুরুত্ব অনেক। তাই বলা যায় জীবনের চাহিদার পর্যায়টি জানা থাকলে শিক্ষকের জন্য সঠিক সময়ে ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩

ক. বহু নির্বাচনীমূলক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. চাহিদা তত্ত্বটির প্রবর্তক কে?
   ক. আব্রাহাম মাশ্‌লো
   খ. জন ডিউই
   গ. বি.এফ. স্কিনার
   ঘ. ই.এল. থর্ণডাইক

২. মাশ্‌লোর চাহিদা তত্ত্বের সর্বশেষ ধাপ কোনটি?
   ক. জৈবিক চাহিদা
   খ. স্নেহ, ভালোবাসার চাহিদা
   গ. আত্মপূর্ণতার চাহিদা
   ঘ. আত্মমর্যাদার চাহিদা

৩. রুপাই শ্রেণিকক্ষে প্রায় সময়ই অমনোযোগী থাকে। তার পরিবারের অবস্থা ভালো। তার মা-বাবা সব সময়ই বাইরের কাজে ব্যস্ত থাকে, যা রূপাইকে প্রভাবিত করে। এখানে রূপাই-এর কোন চাহিদার অভাব রয়েছে।
   ক. জৈবিক চাহিদা
   খ. স্নেহ, ভালোবাসার চাহিদা
   গ. আত্মপূর্ণতার চাহিদা
   ঘ. আত্মমর্যাদার চাহিদা

উত্তরমালা: ১.ক, ২.গ, ৩.খ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. আব্রাহাম মাশ্‌লোর চাহিদা তত্ত্বের মূল কথা কী?
২. মাশ্‌লোর চাহিদা তত্ত্বের ধাপগুলোর নাম লিখুন।
৩. আত্মমর্যাদার চাহিদা কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন:

১. আব্রাহাম মাশ্‌লোর চাহিদা তত্ত্বের ধাপগুলো বর্ণনা করুন।
২. শিক্ষক কিভাবে চাহিদা তত্ত্বকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারেন?- আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

পাঠ- ৮.৪: শিক্ষকের জন্য মনোবিজ্ঞান
Psychology for Being a Teacher

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- আদর্শ শিক্ষকের গুণাবলির বিবরণ দিতে পাবেন।
- শিক্ষকের দক্ষতাগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

শিক্ষক হচ্ছেন মানুষ গড়ার কারিগর। স্যার জন এ্যাডাস্ এর ভাষায় "A maker of men"। পার্ভিসেল রেন বলেন, "শিক্ষক শুধু খবরের উৎস বা ভাণ্ডার নন, কিংবা প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার তথ্য সরবরাহকারী নন, শিক্ষক শিশুর বন্ধু, পরিচালক ও যোগ্য উপদেষ্টা; একজন সুদক্ষ শরীর গঠনকারী, শিশু মনের বিকাশ সাধনের সহায়ক তথা তাদের চরিত্র গঠনেরও নিয়ামক"। রবিন্দ্রনাথের মতে, উত্তম শিক্ষক হবেন উত্তম ছাত্র; শিক্ষকের ছাত্রত্ব গ্রহণে তাঁর মনের তারুণ্য নষ্ট হতে পারে না, বরং তিনি সব সময়ই ছাত্রদের সবিধা-অসুবিধা ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হবেন এবং এ কারণেই তিনি শিশুদের মনের একান্ত কাছকাছি থাকবেন।

বস্তুত শিক্ষককে জীবন্ত উপাদান নিয়ে কাজ করতে হয় বলেই শিক্ষকতা একটি উঁচুদরের শিল্প। কোমল মতি শিশুদের জীবনকে প্রতিদিন কথা ও কাজের আয়োজন-উপচারের মাধ্যমে বাঞ্ছিত প্রয়োজন সাধনের উপযোগী জীবন যাপনের পথে একটু একটু করে এগিয়ে দিতে হয়। শিশুদের জীবনের সর্বাঙ্গীন চাহিদা, মেধা ও প্রবণতার অনকূল পরিচর্যার সযত্ন দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে শিক্ষকের উপর। সুতরাং শিক্ষাকর্মে বাঁধাধরা কার্যপ্রণালী ও পরিকল্পনা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে শিক্ষকের জ্ঞান- অভিজ্ঞতার প্রয়োগ অপরিহার্য। শিশুদের আগামী দিনের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার কাজে তাঁর, ত্যাগ-তিতিক্ষা, নিষ্ঠা-সততা, মমতা ও সহৃদয়তা সেবাধর্মী মনোভাবের স্পর্শে সুন্দর ও সার্থক হবে- এটাই কাম্য। ফ্রোয়েবেলে কথায়, "শিক্ষকের কাজ- ফুল বাগানের মালির কাজ। শিশু চারার লালন-পালন ও রক্ষণের কাজ। এ চারায় সবুজ পাতা, রঙিন ফুল এবং সুস্থ, সুস্পষ্ট ফল ধরানোর কাজ"। শিক্ষকের এই মহান কর্ম সম্পাদনের জন্য অবশ্যই শিক্ষকের মৌলিক কিছু গুণ ও দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীবৃন্দ এই পাঠে আদর্শ শিক্ষকের গুণ ও দক্ষতা নিয়ে আলোচনা করা হলো।

সার্থক শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য

কি কি বৈশিষ্ট্য থাকলে সুশিক্ষক হওয়া যায়, এ নিয়ে মনোবিদ, শিক্ষাবিদ এবং চিন্তাবিদরা বহুদিন ধরে আলোচনা করে আসছেন। শিক্ষাবিদ গিলবার্ট হায়াটের মতে, সুশিক্ষকের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য ৩টি। যথা: (১) ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি প্রীতি, (২) বিষয় প্রীতি, (৩) নিজ পেশার প্রতি প্রীতি। ছাত্রছাত্রীদের ভালোবাসতে না পারলে তার শিক্ষকতা পেশায় ব্রতী হওয়া সমীচীন নয়। বিষয়প্রীতি না থাকলে তাঁর বিষয়ের প্রতি অনুরাগ এবং বিষয়ে অধিকার জন্মাবে না। আর নিজ পেশার প্রতি প্রীতিবর্জিত শিক্ষক যে সুশিক্ষকের প্রথম শর্ত পূরণে অক্ষম, তা বলা বাহুল্য।

আমরা এই পাঠে আদর্শ শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব। আলোচনার সুবিধার জন্য এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে দু'শ্রেণিতে ভাগ করা হলো–

ক. ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বা গুণ;
খ. পেশাগত বৈশিষ্ট্য বা দক্ষতা।

অনেকে অবশ্য এই শ্রেণি বিভাগ অন্যভাবে করেছেন। যেমন, কেউ বলেছেন– অর্জিত ও অনর্জিত গুণ; আবার কেউ বলেছেন, ব্যক্তিগত গুণ বা বৃত্তিগত গুণ ইত্যাদি। যে কোন ধরনের শ্রেণিবিভাগই হোক না কেন শিক্ষকের যে কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকার প্রয়োজন, সে বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত।

ক. ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য

যে সব ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য শিক্ষার সহায়ক, তাকে বলা হচ্ছে শিক্ষকের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য। এই গুণগুলির মধ্যে কতগুলো আছে দৈহিক, কতগুলি মানসিক, আবার কতকগুলো জন্মগতভাবে পাওয়া এবং কতগুলি অর্জন করা। অর্জিত এবং অনার্জিত এই দু'ধরনের শ্রেণি বিভাগের অসুবিধা আছে। অনার্জিত গুণের উপর ভিত্তি করেই অর্জিত গুণ বিকাশ লাভ করে। আবার অনেক অনার্জিত বৈশিষ্ট্যের পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার ফলে পরিবর্ধন হয়। তাই সেই ধরনের শ্রেণিবিভাগ আমরা এখানে করার চেষ্টা করব না। তবে সাধারণভাবে একজন সফল শিক্ষকের মাঝে যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা প্রয়োজন সেগুলো হলো–

১. **ব্যক্তি সত্ত্বার সংলক্ষণ:** সুশিক্ষক আদর্শ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবেন। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় মনে করা হয় শিক্ষক হবেন শিক্ষার্থীর বন্ধু এবং সমাজেরও বন্ধু। তাই বন্ধুভাবাপন্ন হওয়ার জন্য ব্যক্তিত্বের যে সব সংলক্ষণ থাকা উচিত, তা তাঁর মধ্যে থাকবে। তার ব্যক্তিত্ব এমনভাবে সংগঠিত হবে, যাতে করে তিনি স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তিনি সার্থকভাবে অভিযোজন করতে পারবেন, সে রকম ব্যক্তিত্ব যেন তাঁর থাকে।

২. **তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং বিচারশক্তি:** সুশিক্ষকের বুদ্ধি এবং বিচারশক্তি সাধারণ যে কোন বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তির চেয়ে বেশি হওয়ার দরকার। শ্রেণিকক্ষে নানারকম সমস্যার উদ্ভব হতে পারে। সেই সমস্যাকে সার্থকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শিক্ষকের নির্দিষ্ট যোগ্যতা তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বিচার শক্তি থাকা দরকার। যাতে তিনি এসব সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধানের জন্য উপায় উদ্ভাবন করতে পারেন।

৩. **দায়িত্ববোধ:** সুশিক্ষকের যথেষ্ট দায়িত্ববোধ থাকবে। তিনি সবসময় সচেতন থাকবেন; ব্যক্তি হিসেবে সমাজ তাঁর উপর গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছে। শিক্ষক যদি তাঁর এই গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন না থাকেন, তবে তিনি কোন দিনই সুশিক্ষক হতে পারবেন না। সুশিক্ষক তিনি, যিনি তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থেকে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার গঠনে সাহায্য করবেন তাঁর নিজস্ব আচরণ, চিন্তাধারা, মন্তব্য ইত্যাদির দ্বারা।

৪. **প্রগতিশীল চিন্তার স্রষ্টা ও রক্ষক:** সুশিক্ষক তাঁর চিন্তায় এবং আচরণে প্রগতিশীল হবেন। শিক্ষক যদি আধুনিক চিন্তাধারায় বিশ্বাসী না হন তাহলে তিনি আধুনিক জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষাপরিকল্পনা রচনার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। জীবনের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তিনিই প্রথম সারিতে প্রথম পা বাড়াবেন। তবেই শিক্ষার্থীরা তাল মেলাতে পারবে। তিনি আধুনিকতার সৃষ্টিকর্তা হবেন, তিনিই তাঁর রক্ষক হবেন।

৫. **শিশু বান্ধব মন:** শিক্ষক হবেন শিশু বা শিশু বান্ধব মনের অধিকারী। শিশুকে ভালো না বাসলে তিনি শ্রেণিকক্ষের বাইরেও যে তাদের সজীব মনের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, স্বপ্ন-সাধ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা, অনুরাগ-অভিমান আছে তার খবর পাবেন কী করে? এ জন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "কি শিখাব তা ভাববার কথা বটে, কিন্তু যাকে শিখাব তার সমস্ত মনটা কী করে পাওয়া যেতে পারে, সেটাও কম কথা নহে"। শিক্ষকের মধুর মনোভঙ্গি, সহজ প্রসন্নতা, সাহায্যদানের সদিচ্ছা অতি সহজেই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে ঘিরে রচনা করে প্রীতিময় পরিমণ্ডল। নিরাপত্তা ও নির্ভরতারতার সখ্যতায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নৈকট্য সহজ ও প্রাণময় হয়ে ওঠে। বিদ্যার্জন অনায়াস, আনন্দময় এবং অর্থবহ হবার অবকাশ পায়।

৬. **প্রক্ষোভমূলক পরিণমন:** সুশিক্ষকের আর একটি লক্ষণ হল তাঁর প্রক্ষোভমূলক জীবনের পরিণমন। তিনি অল্পে নিরাশ হবেন না। কোন ব্যর্থতা যেমন সহজভাবে নেবেন, তেমনি আবার কোন সাফল্যকে সংযমের

সঙ্গে গ্রহণ করবেন। আত্মসংযম, চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কাজ চালিয়ে যাওয়ার মত মানসিক ধৈর্য্য শিক্ষকের থাকা উচিত।

৭. **উন্নত জীবনাদর্শ:** সুশিক্ষকের আর একটি বড় গুণ হল যে. তিনি উন্নত জীবনাদর্শ গ্রহণ করবেন। শিক্ষার্থীরা তাঁকে দেখেই অনুকরণ করতে শিখবে। শিশুদের মধ্যে সঠিক জীবনাদর্শ গড়ে তুলতে হলে শিক্ষককে উন্নত জীবনাদর্শের অধিকারী হতে হবে।

৮. **স্বাধীন চিন্তা করার ক্ষমতা:** সুশিক্ষকের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল স্বাধীন চিন্তা করার ক্ষমতা। আধুনিক সমাজব্যবস্থায় আদর্শ নাগরিক হতে হলে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা থাকার দরকার। শিশুদের মধ্যে এই ক্ষমতাকে জাগাতে হলে শিক্ষককেও সেই ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার দরকার।

৯. **সেবাধর্মী মনোভাব:** শিক্ষকতা হল মহান বৃত্তি। এই মহান বৃত্তি মানুষকে তাঁর যোগ্যতা ও সেবার গুরুত্বের উপযোগী ফল সব সময় দেয় না। অর্থের চেয়ে আদর্শই এই বৃত্তি নির্বাচনের মূল কথা। তাই সুশিক্ষককে সেবাধর্মী মন নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সেবার মনোবৃত্তি যদি না থাকে, তিনি যদি মনে করেন যে, তিনি কর্মের দ্বারা মানুষের সেবা করছেন, তাহলে তিনি শিক্ষকতা কাজে তৃপ্তি পাবেন না এবং তাঁর দ্বারা শিক্ষার আদর্শের ও বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব হবে না।

১০. **অধ্যয়নশীল:** উত্তম শিক্ষক একজন উত্তম ছাত্র। সুশিক্ষকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তিনি হবে জ্ঞান পিপাসু। জীবন পরিসরের মধ্যে জ্ঞান অর্জন করা খুব সহজ কাজ নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পড়া শেষ করলেই সব জানা হয় না। শিক্ষক জ্ঞানের জন্য তপস্যা করবেন এবং আজীবন জ্ঞান আহরণে ব্যাপ্ত থাকবেন, তবেই তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সেই তৃষ্ণা জাগ্রত করতে পারবেন। শিক্ষকের মধ্যে যদি জ্ঞান আহরণের আকাঙ্ক্ষা প্রবলভাবে জ্বলতে না থাকে, তিনি কখনই ছাত্রদের জ্ঞান আহরণে উৎসাহিত করতে পারবেন না।

১১. **রসজ্ঞান:** সুশিক্ষক অবশ্যই রসিক হবেন। মানব চরিত্রায়ণ এবং জীবনের জীবনায়ন যার মূল ব্রত, তাঁকে শিল্পী জনোচিত রস সংবেদনের অনুরাগী ও অধিকারী হতে হবে। তিনি শিক্ষার্থীদের আনন্দ বিতরণ করবেন, তাদের আনন্দের অংশীদার হবেন কিন্তু আনন্দের উপলক্ষ হয়ে তামাশার কারণ হবেন না। শ্রেণিকক্ষের ভাবগম্ভীর বিষয়বস্তুকে সরস করার জন্য এই ধরনের রসজ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে গতানুগতিক আলোচনা শিশুদের কাছে নীরস হয়ে পড়ে এবং শিক্ষক তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে না।

১২. **দৈহিক বৈশিষ্ট্য:** শিক্ষক সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবেন। তিনি যদি ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী না হন, তাহলে তাঁর পক্ষে এই বৃত্তিতে থাকা অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। শিক্ষক দৈহিক দিক থেকে সুশ্রী হলে ভাল হয়। তার কারণ, ছাত্ররা এতে তাঁর প্রতি সহজে আকৃষ্ট হয়। শিক্ষকের গলার স্বর ও বাচনভঙ্গি ভাল হওয়ার দরকার। এতেও ছাত্ররা শিক্ষকের প্রতি সহজে আকৃষ্ট হয়। সুতরাং এই সব দৈহিক বৈশিষ্ট্য শিক্ষকের থাকলে ভাল হয়।

১৩. **মানসিক স্বাস্থ্য:** সামগ্রিকভাবে মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া শিক্ষকের পক্ষে একান্তভাবে প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশসাধন করা শিক্ষকের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। তিনি নিজে যদি মানসিক দিক থেকে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন, তাহলে কখনই শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশে সহায়তা করতে পারবেন না। যে সব মানসিক বৈশিষ্ট্য থাকলে শিক্ষক মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হবেন, সেগুলি হলো ছাত্রদের সঙ্গে আদর্শ সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতা, প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, নিজের দোষত্রুটির সঠিক মূল্যায়নের ক্ষমতা, মানসিক সন্তুষ্টি ইত্যাদি।

খ. পেশাগত বৈশিষ্ট্য বা দক্ষতা

শিক্ষকের ব্যক্তিগত, চারিত্রিক, দৈহিক এবং মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়া আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত। এই বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে তাঁর পেশাগত দায়িত্বকেন্দ্রিক। এই ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলিকে আমরা বলছি পেশাগত বৈশিষ্ট্য বা দক্ষতা। শিক্ষকতা বৃত্তিতে এই বৈশিষ্ট্যগুলির গুরুত্ব অনেক বেশি।

১. **বিষয় জ্ঞান:** ভালো শিক্ষক হবরা জন্য শিক্ষণীয় বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তাঁর জ্ঞান যে কেবলমাত্র শিক্ষণীয় বিষয়টিতে থাকবে তা নয়, জ্ঞানের সমস্ত শাখার সঙ্গে তার পরিচিতি থাকা দরকার। ছাত্রদের জ্ঞানস্পৃহা বা কৌতুহলকে তৃপ্ত করার জন্য তাঁর সকল বিষয়ে জ্ঞান থাকার প্রয়োজন।

২. **শিক্ষণ পদ্ধতির জ্ঞান:** শুধুমাত্র বিষয়কেন্দ্রিক জ্ঞান থাকলেই সুশিক্ষক হওয়া যায় না। সেই জ্ঞানকে ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করার দক্ষতা তাঁর থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ, আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা থাকা চাই এবং সেগুলোকে কিভাবে কার্যকরী করা যায়, সে বিষয়ে তাঁর প্রশিক্ষণ থাকা দরকার।

৩. **শিশু মনোবিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান:** সুশিক্ষকের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করার জন্য শিশু মনোবিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। তিনি শিশুদের মানসিকতা সম্বন্ধে যদি কিছু না জানেন, তবে তাদের পরিচালনা করা তাঁর পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়ে। এছাড়া, সমাজ মনোবিজ্ঞান সম্পর্কেও তাঁর ধারণা থাকার প্রয়োজন। দলগত মন কিভাবে কাজ করে, সে সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত ধারণা না থাকলে শিক্ষার্থীদের দলগত আচরণকে তিনি যথাযথভাবে শিক্ষার কাজে লাগাতে পারবেন না।

৪. **পাঠের সূচনা ও উপস্থাপন:** এই কৌশলটি পুরো শ্রেণিকে পাঠ গ্রহণের জন্য উন্মুখ করে তোলার সাথে সম্পর্কিত। পাঠদানের সূচনা পর্বটি যদি আকর্ষণীয় ও উপযুক্ত হয় তাহলে ছাত্রেরা পাঠ গ্রহণের ক্ষেত্রে অনেকখানি অগ্রসর হয়। উপস্থাপনের কতগুলো রীতি-পদ্ধতি রয়েছে। সেই রীতি-পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করে শিক্ষক পাঠদান করবেন। যেমন– একটি গল্প বলে, ধাঁধা দিয়ে বাংলার পাঠ উপস্থাপন করা যেতে পারে।

৫. **সমাপ্তি:** ছাত্রছাত্রীরা পাঠটি আয়ত্ত করতে পেরেছে কিনা এবং পাঠের মূলকথা অনুধাবন করতে পেরেছে কিনা অর্থাৎ পাঠদানের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করা হয় সমাপ্তিকরণ পর্বে।

৬. **নীরবতা ও অমৌখিক ইঙ্গিত:** অনেক শিক্ষক খুব বেশি কথা বলেন। এই অভ্যাস পরিবর্তনেরন জন্য নীরবতা পালন ও অমৌখিক ইঙ্গিত দানের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। নীরবতার কৌশলটি যদি সঠিক ও সময়োচিতভাবে প্রয়োগ করা যায় তাহলে অনেক সময় কথার চাইতে অনেক বেশি কার্যকর ফল দেয়।

৭. **বলবর্ধক কৌশল:** আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর প্রতি অসচেতনভাবে হলেও বিরূপ বা শাস্তিজনক মন্তব্য না করার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। শিক্ষার্থীর কাজের স্বীকৃতি দেওয়া, উৎসাহ দেওয়া বা পুরস্কৃত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখনের গতিকে ত্বরান্বিত করাই বলবর্ধক কৌশলের মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষাদানকে ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষকের মাঝে এই কৌশলটি প্রয়োগের দক্ষতা থাকতে হবে।

৮. **পরীক্ষামূলক মনোভাব:** সুশিক্ষকের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল পরীক্ষামূলক মনোভাব। তিনি যে শুধু গতানুগতিক শিক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করবেন তা নয়, বিশেষ শিক্ষা পরিস্থিতিতে শিক্ষণ পদ্ধতিকে পরিবর্ধন করাও তাঁর কাজ। অনেক সময় বিদ্যালয়ে শিখন শিখানো কাজে কিংবা শিক্ষার্থীদের মাঝে আচরণিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। সেই সমস্যাকে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে সমাধান খুঁজে বের করার মত স্পৃহা ও যোগ্যতা সুশিক্ষকের থাকা দরকার।

৯. **উপকরণের ব্যবহার:** আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে সমতা রক্ষা করতে হলে শিক্ষককে বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার সম্পর্কে জানতে হবে। কারণ, আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির একটি বড় কথা হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতাই শিশুদের কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য অভিজ্ঞতা। সুতরাং শিক্ষাদানের জন্য ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগানোর জন্য এসব উপকরণ ব্যবহার করার মত মানসিক প্রস্তুতি শিক্ষকের থাকবে এবং উপকরণ প্রস্তুতিকরণ ও ব্যবহারবিধি সম্পর্কেও ধারণা থাকা দরকার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৪

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ফ্রোয়েবেল শিক্ষকের কাজকে কার কাজের সাথে তুলনা করেছেন?
   ক. ডাক্তার
   খ. ইঞ্জিনিয়ার
   গ. কৃষক
   ঘ. মালি

২. উত্তম শিক্ষক হবেন উত্তম ছাত্র উক্তিটি কার?
   ক. সক্রেটিস
   খ. প্লেটো
   গ. স্বামী বিবেকানন্দ
   ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩. কোনটি বলবর্ধক কৌশলের উদাহরণ?
   ক. শিক্ষার্থীর প্রশংসা করা
   খ. শিক্ষার্থীকে শাস্তি প্রদান
   গ. দলীয় কাজ প্রদান
   ঘ. একক কাজ প্রদান

উত্তরমালা: ১. ঘ, ২. ঘ, ৩. ক।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ রচনামূলক প্রশ্ন

১. উত্তম শিক্ষক হবেন উত্তম ছাত্র- ব্যাখ্যা করুন।
২. শ্রেণিতে বলবর্ধক কৌশল কীভাবে প্রয়োগ করবেন বর্ণনা দিন।
৩. শিক্ষকের দক্ষতাগুলো উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. আদর্শ শিক্ষকের বৈশিষ্ট্যাবলির বিবরণ দিন।
২. শিক্ষকের দক্ষতাগুলো বর্ণনা করুন।
৩. শিক্ষক মানুষ গড়ার কারিগর- ব্যাখ্যা করুন।
৪. শিক্ষকতা সহজাত না অর্জিত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।